জমিন

সাকিল আহাম্মেদ

তিনি শুয়ে পড়লেন আধা ঘন্টা আগে। সেটা রাত বারটার পরেই হবে। তাঁর সাড়া শরীর ও মনমগজে ক্লান্তি ছিল। সেই কাকডাকা ভোরে জেলাশহর থেকে অফিসের গাড়ী করে বিভাগীয় শহরের দিকে রওনা হওয়া, তারপর ৯টার মধ্যে বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে এসে একটানা মিটিং; সেই সকাল ৯.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত। তারপর অন্যান্য ডিসিদের সাথে খোষগল্প ও ডিনার সেড়ে বিভাগীয় শহরের এই সার্কিট হাউজে ফিরতে ফিরতে তাঁর সাড়ে এগারোটা বেজে গেল। এরপর কোনমতে একটু ফ্রেশ হওয়া, নামাজ পড়া এবং বাসায় ফোন করে খোঁজ খবর নেয়া। অতপর, শুয়েপড়া এবং অতিঅল্প সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া।

ঘুমের মধ্যে কি যেন একটা এলোমেলো সিরিয়ালের স্বপ্ন দেখতে ছিলেন তিনি। স্বপ্নের মধ্যেই তাঁর মনে হলো স্বপ্নটা তিনি প্রায়ই দেখেন। সেই জাহাজ, নীল নীল জল; জলের বুক চিরে তিনি জাহাজটি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ সে জাহাজে আর কেউ নেই। তিনি শুধু একা। চারিদিকে ঢেউখেলানো ধুধু নীল মরুভূমি। উপরে কালো-নীল আসমান। সাইরেন দিতে দিতে তিনি ঢুকে পড়্লেন ক্রমশ-ঘনকালো-সান্ধ্য সমুদ্রে। দুরে কেবল একখানা বিশাল বরফখন্ড; সেটি ঘননীল রং ধারন করে এগিয়ে আসছে। ঝিরঝিরে হিমেল হাওয়া ঘন থেকে ঘনতর হয়ে জাহাজটা অতিক্রম করছে। তিনি জাহাজটার গতি চেঞ্জ করার জন্য খুব চেষ্টা করলেন। জাহাজটা এমন গোঁ ধরা মহিষের মত যে, হাজার চেষ্টাতেও গতি চেঞ্জ করছেনা। এদিকে বিশাল বরফ খন্ডটি আরও স্পষ্ট হয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। তিনি জাহাজের প্রোপেইলর ৩৬০ ডিগ্রী করে দশবার ঘুরিয়ে ফেলেন। কিন্তু কোন কাজ হয় না। জাহাজটি যেন সত্যি-সত্যি গোঁধরা এক মহিষ, বিশাল শিং নাড়ছে আর চোখ দু'টো রক্তবর্ণ করে ফোস্ ফোস্ করছে; এই বুঝি পাহাড়-সমান সেই বরফের সাথে লড়াই করবে। নিজেকে অসহায় মনে হলেও সামলিয়ে নেন তাড়াতাড়ি। ভাবেন, ডিসি আকরাম শক্তহাতে যে কাজ ধরেছে তা কখনো বিফল হয়নি। তিনি দৃষ্টি দৃঢ় করে প্রপেইলরটি শক্ত করে ধরলেন।

হঠাৎ মোবাইল ফোনের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গেঁ যায়। মোবাইলটা একটানা বেজে বন্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর রোমাঞ্চকর স্বপ্নটা তিনি আজও শেষ করতে পারলেন না। এই শেষ না করার অতৃপ্তি তার মনে শীতের সকালে সদ্য নামানো গরম ভাপা পিঠার ধোঁয়ার মত ফঁনা তুলে উড়তে থাকে। কিছুক্ষন পর মোবাইলটি আবার বেজে উঠলে তিনি সেই ফ্যাকাসে ফঁনার নাচন দেখতে দেখতেই মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়ে রিসিভ করেন এবং শুয়ে থেকে কানের কাছে মোবাইল নিয়ে কণ্ঠ গম্ভীর করে 'হ্যালো' বলেন। তিনি 'হ্যালো' বলার আগেই অপর পাশে কি যেন বলা শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা গেলনা। তিনি একটু মনোযোগ দিলেন। হ্যা, বোঝা যাচ্ছে; অ্যাঁ কি বলছে এসব! "ঐ মুরগী চোর, মুরগী চোর, মুরগী চোর !"

তিনি আরও একটু গভীর ভাবে মনোযোগ দিলেন, সঠিক কী বলছে তা বোঝার জন্য। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল, অপর পাশে কর্কশ এক মহিলাকণ্ঠ অবিরাম বলে চলেছে-

ঐ মুরগী চোর, মুরগী চোর, মুরগী চোর !
ঐ মুরগী চোর, মুরগী চোর, মুরগী চোর !

তিনি কয়েক বার 'হ্যালো! 'হ্যালো! করলেন। কিন্তু অবিরাম একই কোরাস তাঁর কানে বেজে চললে-

তিনি একটু রাগ হলেন, মোবাইলের স্ক্রীনে নম্বরটি দেখার চেষ্টা করলেন। না! কোনও সাধারণ নম্বর নয়! শুধু অ-১ লেখা! সম্ভবত ইন্টারনেট থেকে কেউ ফোন করেছে। কোরাসটি সম্ভবত সফটওয়ার হিসেবে দেয়া, মোবাইলে সংযোগ পেলে অটোমেটিক সেটা বাজতে থাকে। তিনি সংযোগটি কেটে দিয়ে কতক্ষন ভুতগ্রস্থ মানুষের মত নির্জীব শুয়ে থাকেন। তাঁর কানে শুধু ঐ কোরাসটি সদ্য-ডিম-পেরে-উঠা মুরগীর গর্বিত ও কর্কশ গলার অবিরাম ”ক্ ক্ ক্ ক্ রস, ক্ ক্ ক্ ক্ রস” ধ্বনির তালে ও লয়ে ক্রম-উচ্চ-স্বরে বেজে চলল। কিছুটা সময় পর সেই ধ্বনির তাল ও লয়ের একটু চাপ তিনি তাঁর তলপেটে অনুভব করলে রুমের ফুললাইট অন করে তিনি টয়লেটে গেলেন।

অনেকটা সময় পর তিনি টয়লেট থেকে ফিরে এসে সিগারেট ধরান এবং গাঁয়ে তোয়ালে জড়িয়ে বারন্ধায় যান। বাহিরে তখন হালকা ঝিরঝির বৃষ্টি এবং শ্রাবনের আকাশটায় ক্ষরে যাওয়া চাঁদকে ডনকেয়ার করে পোয়াতী- মেঘগুলোর হিমালয় পানে ছুটে চলার নিরন্তর প্রতিযোগীতা চলছে। সার্কিট হাউজের তিনতলায় তাঁর এই রুম। বারান্দায় একটা টি টেবিল পাড়া। দু'পাশে দু'টি চেয়ার। তিনি একটি চেয়ারে পাঁ'তুলে বেশ জড়সড় হয়ে বসেন। তাঁর কানে কোরাসটি তখনও বেজে চলেছে। তিনি ভাবতে থাকেন, কে এমন করল? কে হতে পারে? তোরাব আলী কি? কিন্তু, তোরাব আলী কি এরকম করবে?

তোরাব আলীর সাথে সে একবার মুরগীচুরি করেছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। তারা দু'জনেই তখন এক সাথে পড়তো, এক সাথে ঘুমাতো। একই ক্লাসের ছাত্র ছিল তারা। তখন তারা ক্লাস নাইন কি টেনএ পড়ে। পৌষ মাস। চারি দিকে পৌষ পার্বনের পিকনিক খাওয়ার ধুম। একরাতে তোরাব আলী পড়ার টেবিল থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায়। বলে, আকরাম, 'চল্ হামরা আজ পিকনিক খ্যামো'। 'পিকনিক খাবু, তা' তোরা চাল কয়? আলু কয়? ডিম কয়?' তোরাব আলী আকরামের হাত ধরে একটা জোড়ে ঝামটি দিয়ে তুলে নিয়ে যায়। বলে, 'অত পন্ডিতগিরি মারাসনে তো, উঠে আয়, উগ্‌লে হামি ব্যবস্তা করিচ্ছি; তুই খালি হামার সাথে থাকবু।'

চাল,ডাল,আলু,মশলা, হাড়ি-পাতিল এগুলোর ব্যবস্থা তোরাব আলী করেছিল। সে এগুলো তার মা'এর কাছ থেকে নিয়েছিল। কেবল দু'টো মুরগী চুরি করতে হয়েছিল অন্যের ঘর থেকে। তাও আবার যার-তার ঘর থেকে নয়; গ্রামের যে সাইনুর মেয়েটির সাথে তোরাব আলী লাইন জমিয়েছিল, যার সাথে রাত-বিরাতে লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতো, তার ঘর থেকে। তোরাব আলীই মুরগী দু'টো চুরি করেছিল। সে কেবল সাথে ছিল। হাড়ি-পাতিল, চাল-ডাল এগুলো সাথে নিয়ে সে কেবল তোরাবের পিছনে পিছনে হেটেছে।

সাইনুরের বাড়ির একটু সামনেই যমুনা নদী। পার বেয়ে নিচে নেমে ছোট একটা বালুচর ধরে একটু এগুলেই মুল নদী। সে নদীর পারেই চুলা তৈরী করে তারা রান্না-বান্না করে এবং দু'জনেই সবগুলো খাবার সাবার করে দিয়ে ঘরে ফেরে। সে রাত ছিল জ্যোৎসনা রাত। কেবল হালকা কুয়াশা ছড়ানো ছিল চারিদিকে। তোরাবা আলী, ফেরার পথে সাইনুরের সাথে দেখা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ফিস-ফিস করে অনেক ডাকা-ডাকির পরও সাইনুরের কোন সাড়া না পেয়ে মন খারাপ করে চলে আসে। সে রাতে তোরাবা আলী তাকে জড়িয়ে ধরে, ধস্‌তা-ধস্‌তি করে, বার-বার লুঙ্গিঁ উঠাতে চায়। কিন্ত সে সায় দেয়নি বরং পেশাব করার কথা বলে বাহিরে এসে রাস্তায় একাকি হাটা-হাটি করে বাঁকি রাতটা পাড় করে। সেই রাতের পর থেকে তোরাব তাকে আর বিরক্ত করেনি বরং একসাথে থাকলেও আট-সাট হয়ে ঘুমাতো, অথবা অন্যঘরে ঘুমাতো।

তোরাবআলীদের বাড়ীতে যখন সে আসে, তখন সে ক্লাশ সিক্সে। তার নিজের গ্রাম যমুনানদীর দুবলাডাঙ্গাঁর চরে তখন কোন স্কুল ছিলনা। তার বাবা গ্রামের যে মক্তবে পড়াতো সেখানেই সে বাবার কাছে আরবী, বাংলা, অংক এবং অল্প-স্বল্প ইংরেজি পড়েছিল। মা'র অনুরোধে বাবা

তাকে হরিখালী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দেয়। এবং নদীর পশ্চিম পাশে তেকানী গ্রামে মা'র খালাত বোন রেজিদা খালা, মানে তোরাবআলীর মা, তাদের বাড়িতে জায়গীরের ব্যবস্থা করে দেয়। সেই থেকে ম্যাট্রিক পাশ করা পর্যন্ত সে এই তোরাবদের বাড়ীতেই থেকেছে। এখান থেকেই সাত কিলোমিটারের পথ পায়ে হেটে প্রতিদিন স্কুল করেছে। সাথে তোরাবআলীও । যদিও তোরাব বয়সে তিন বৎসরের বড় ছিল। বাবা চেয়ারম্যান হওয়ায় এবং বেশ অবস্থাসম্পন্ন হওয়ায় পড়া-লেখার প্রতি তোরাবের খুব একটা আগ্রহ ছিলনা। ম্যাট্রিকে সে যখন ষ্টার মার্কস সহ প্রথম বিভাগ নিয়ে পাশ করে বগুড়া সরকারী আযিযুল হক কলেজে ভর্তি হলো; তোরাব তখন কোন মতে সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করে সোনাতলা থানাসদরের এক কলেজে ভর্তি হলো। এখান থেকে তোরাব ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে; দু'তিন বার ফেল করার পর ডিগ্রীও পাশ করে এবং বগুড়া ল'কলেজ থেকে ল' পাশ করে বগুড়া কোর্টে প্রাক্টিস করে। পরে তার বাবা মারা গেলে গ্রামে ফিরে চেয়ারম্যানিটা কবজা করে। সেই থেকে সে চেয়ারম্যানিটা এখনো ধরে রেখেছে। চেয়ারম্যান ও এ্যাডভোকেট মোঃ তোরাব হাসান, এখন জেলাশহর বগুড়ায় থাকে। বউ, ছেলে-মেয়ে নিয়ে। যদিও সেই সাইনুর মেয়েটাকে সে বিয়ে করেনি। শহরের কোন এক প্রবীন এ্যাডভোকেটের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই শহরে দু'টো বাড়িও করেছে, বেশ কিছু জায়গাও করেছে। রেলমার্কেটে দু'টো দোকান নিয়েছে। প্রাইভেট গাড়ি হেকে প্রতি সপ্তাহে গ্রামে যায়। দেন-দরবার করে। চেয়ারম্যানি করে। ছাত্রবেলার রাজনীতির দল ত্যাগ করে সে বরাবরই সরকারীদল করে আসছে। সামনের সংসদ নির্বাচনে সুবিধামত কোন দল থেকে মনোনয়ন নেয়ারও চেষ্টা তার।

বারান্দার ওপারের ঝিরিঝিরি বৃষ্টির গায়ে দমকা বাতাসের নাঁচন লেগেছে। সে নাঁচনে বেসামাল হয়ে বৃষ্টি-বধুর ভেজা-আঁচল ডিসি আকরাম সাহেবের চোখে মুখে ও স্যান্ডগেঞ্জি পরা খোলা বুকে ঝাপটা দিয়ে যায়। আচমকা হিমেল সেই পরশে তিনি একটু নড়েচড়ে বসেন। লম্বা-ছাই-জমানো সিগারেটে বার দুই টান দিলে তার হালকা একটু ঝিমেনি আসে। বাহিরের বৃষ্টি ততক্ষণে গাঢ় হয়ে পড়েছে। ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি সার্কিট হাউজের গোটা চত্তরজুড়ে। অদুরে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে লাইটপোষ্টটা পড়া-ভুল-করা ছাত্রের মত মাথা নত করে নির্বিকার ভাবে বৃষ্টির বেত্রাঘাত সইছে। আকরাম সাহেব লাইটপোষ্টের নির্বিকারতা এবং আলোজ্বেলে রাখার বিনীত নিবেদন দেখে নিজের মাঝে কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথার খচ্‌খচানী অনুভব করতে থাকেন। এ্যাডভোকেট তোরার হাসান, যেবার নতুন চরের পাঁচশত বিঘার বেশি খাস জমি নিজের নামে কাগজ করে নেয়, সেবার তোরার তাকে সেঁধেছিল, বলেছিল, "আকরাম তুমিতো এখন ডিসি হয়েছ, তোমার হাতে অনেক ক্ষমতা, বগুড়ার ডিসি সাহেবকে বলে তুমি নতুন চরের খাস জমিগুলোর একটা পাঁকা কাগজ করে দেয়ার ব্যবস্থা কর। নতুন চরটা তুমি আর আমি সমান ভাগে ভাগ করে নেই।" বৎসর খানিক পরে তোরাব আলী তাকে আবারও সেঁধেছিল: বগুড়ায় এক মারোয়াড়ি বাড়ী, তা' বিঘা পাঁচেকের মত হবে, সেটা খাস দেখিয়ে নিজেদের নামে কাগজ করে নেবার জন্যে। এবারও সমান দু'ভাগে ভাগ করে নেয়ার প্রস্তাব। তারপরের বৎসর রেলমার্কেটের দু'টো দোকান নিজেদের নামে কাগজ করে নেয়ার প্রস্তাব।

না! কোন টাই নয়! কোনটাতেই সে সায় দেয়নি। জনগণের চাকর হয়ে জনগণের সম্পদ হরণ করে দিতে এবং নিতে ডিসি এইচ এম আকরাম আলীর মনের গভীরে যমুনার ঘুর্ণীপাঁকের মত তোলপার শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সেঘুর্ণী থেমে গেছে। আমৃত্যু সৎপথে থাকার দৃঢ় ও সুপ্ত সপথের কাছে মাথা নত করে, বিবেকের শাসনের কাছে আত্মসমর্পন করে সেঘুর্ণীটা আর ফণা তোলেনি; সাপ হয়ে ছোবলও দেয়নি।

তিনি সহযোগীতা না করলেও চেয়ারম্যান ও এ্যাডভোকেট তোরাব হাসান জমিগুলি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কবজা করেছিল। কেবল, মারোয়ারির জমিটা তিনভাগ করে এক ভাগ দিতে

হয়েছেল এক রাজনৈতিক নেতাকে, আরেক ভাগ অন্য এক ডিসিকে। বাঁকী অংশটা এবং চরের পুরো জমি ও রেলমার্কেটের শোরুম দুটো তোরাব আলী নিজের নামেই রেখেছিল।

সেই তোরাব আলীই মাঝে মাঝে ফোন করে, দু'চারটা ভাল মন্দ কথা বলে। বড় ভাই সুলভ শাসনও থাকে সেই ঝাঝালো ফোনে। কখনও কখনও অবজ্ঞা আর ঘৃণাও থাকে । কি আর করা যাবে, সেতো খালাত ভাই, বড়। তাছাড়া, তাদের বাড়িতে থেকে খেয়ে-পড়ে জীবনের ভিত্তিময় ছয়টি বৎসর সুবিধামত ব্যবহার করেই সে মানুষ হয়েছে। আজ সে ডিসি। সে ডিসি আকরামের প্রতি তোরাবদের অনেক অধিকার থাকারই কথা; ডিসি হোক আর যাই হোক, আকরাম সাহেবদের তোরাব আলীদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়ারই কথা।

তোরাব আলীর জমিগুলো নেয়ার ব্যপারে সহযোগীতা না করাতে এবং জমিগুলোর সহজ অংশিদারিত্বের সুযোগ না নেয়াতে একদিন তোরাব ফোন করে বলে, "ফকিরের বাচ্চা ফকির, মানুষ হছিস্তো মান্ষের বাড়িত থ্যাকে থ্যাকে, আর তোর বাপের ভিক্ষ্যাকরা ট্যাকা খরচ করে, নিজের জিনিসের মর্ম বুঝবু ক্যাংকা কর‍্যা, শালা বেন্ন্যার ব্যাটা বেন্ন্যা, নিজের এ্যাকখ্যান জমি থাকলে কি বেশি হয় হে? বাপের কবরটা তো দিছ্লুতো হ্যামাগেরে ভিটেত, সে ভিটেখ্যান নদী ভ্যাঙ্গে নিলো, তোর বাপের কবরট্যাতো সরে নিবের প্যালুনে- সে কবরটাও ভ্যাসে গ্যালো যমুনা নদীত, বাপের কববরের চিহ্ন্ড্যা তো র‍্যাকব্যার প্যালুনে, শালা, হারামির হারামি .....।'

বারান্দার চেয়ারটাতে ডিসি হোসাইন মোহাম্মদ আকরাম আলী। বাহিরে বৃষ্টির ঝাপটা মাঝে মাঝে ফলক দিয়ে এসে তাঁর দৃঢ় ও নির্বিকার মুখে ছোট ছোট বর্শার ফলা হানতে থাকে। তাঁর নিরুদ্বেগ ও নিস্পলক চোখের দুপাশে দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গেলে তাঁর ডান হাতের আঙ্গুলের ফাঁস থেকে পুড়ে-শেষ-হওয়া সিগারেটের লীফটাও ঝরে পড়ে। ঝড়েপড়া লীফটা থেকে শীষওঠা ধোঁয়ার সামনে ডিসি আকরাম আলীকে কালোপাথরের মূর্তির মতই মনে হয়। যেন, কালো সে মূর্তির সামনে ধুপ ও চন্দনের ধোঁয়া এঁকেবেঁকে আকাশ ফুঁরে উঠ্ছে।

সাকিল আহাম্মেদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, আকাশতারা, বগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১২২১৬৫১৫